

শিক্ষণীয় বিষয়



সংকলন ও পরিবেশনায়:
তরবিয়ত বিভাগ
লাজনা ইমাইল্লাহ, বাংলাদেশ
(আহমদী মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন)

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)
বলেন,

“আমাদের জামা’তের সদস্যদের কুরআন
মজীদেৰ অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তাচর্চায় মনপ্রাণ
উজাড় করে দেওয়া উচিত।... বর্তমানে
কুরআনের অস্ত্র তোমরা হাতে নাও— বিজয়
তোমাদেরই। এই জ্যোতির সামনে কোনো
অন্ধকার টিকতে পারবে না।”

[আল-হাকাম, ১৭ অক্টোবর, ১৯০০, পৃ. ৫]

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত, যাঁর অসীম করুণায় সমস্ত ভালো কাজ পরিপূর্ণতা লাভ করে। দরুদ, সালাম আর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি— যিনি কুরআনের শাস্ত্র বাণী আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'লার অশেষ রহমতে লাজনা ইমা'ইল্লাহ বাংলাদেশের তরবিত দপ্তর থেকে 'শিক্ষণীয় বিষয়' বুকলেটটি প্রকাশ করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের এই বুকলেটটির মূল উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী আদর্শ আত্মস্থকরণ, ইসলামী জীবন দর্শন, মৌলিক নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করা। ইসলামী শিক্ষা কেবল একটি ধর্মীয় শিক্ষা নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার অংশ— যা ব্যক্তির চরিত্র গঠন এবং সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে।

আমাদের লক্ষ্য হলো, শিক্ষার্থীরা যেন ইসলামের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি সমাজে সঠিকভাবে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে পারে। এখানে কুরআন করীমের শিক্ষণীয় কিছু আয়াত, বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াতের পর পাঠিত দোয়াসমূহ আছে, কতিপয় হাদীস এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অমৃত বাণী থেকে কিছু শিক্ষামূলক উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমরা আশা করি, এই পুস্তিকার মাধ্যমে আমাদের লাজনা সদস্যরা ইসলামের অনিন্দ্য-সুন্দর শিক্ষা ধারণ করতে এবং তা নিজেদের জীবনে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। এতে তারা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একজন আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠবে, যা ইসলামের মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'লা আমাদের সহায় হোন এবং আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমীন।

আতিয়াতুল অহিদ

নায়েব সদর-৩ ও সেক্রেটারি তরবিত
লাজনা ইমা'ইল্লাহ বাংলাদেশ

ঢাকা

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

হযরত আবু দারদা (রা.) হ'তে বর্ণিত,

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলতেন, কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে কোন মুসলমান ব্যক্তির দোয়া তার জন্য কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফিরিশতা নিযুক্ত থাকে। যখন ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দোয়া করে, তখনই ঐ নিযুক্ত-ফিরিশতা বলেন, আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ। (মুসলিম)

শিক্ষণীয় বিষয়

তরবিয়ত দপ্তর

লাজনা ইমা'ইল্লাহ বাংলাদেশ
(আহমদী মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন)

ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কোনো নতুন ধর্মমত নয়। আহমদীয়াত- খাঁটি ইসলামের অপর নাম। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শেষ যুগে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং হারানো ঈমান পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এক মসীহ ও ইমাম মাহদী আগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যাঁর কাজ হবে ইসলামের খাঁটি শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করা। ইসলামের মৌলিক বিষয়ে অন্যান্য সুন্নী মুসলমানদের বিশ্বাস আর আমাদের বিশ্বাস এক ও অভিন্ন। আমরাও অন্যান্য ফিকার মতো ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভে বিশ্বাস করি বরং আমরা যাকে ইমাম মাহদী বলে মান্য করি তিনিও এই পাঁচটি স্তম্ভে বিশ্বাসী।

তিনি (আ.) বলেছেন, “আমরা মুসলমান। এক অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ’ কলেমায় আমরা বিশ্বাসী।.... আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই।.... আমরা শরীয়তে কোনোকিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশি করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি- আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি- আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহর ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।” [নূরুল হক, খণ্ড: ১, পৃ: ৫]

১) কলেমা:

কলেমা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সংবলিত কয়েকটি আরবি পণ্ডক্তির নাম। এর মাধ্যমেই ইসলামের প্রথম স্তম্ভ পরিপূর্ণতা লাভ করে। ইসলামী পরিভাষায় কলেমা

বলতে নিম্নের বাক্যটিকে বুঝায়-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)

অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র রসূল।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, “আমি আমার জামা’তকে উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের প্রতি ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদা তা’লা এবং তাঁর রসূল (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করে যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে।” [আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭]

২) নামায:

নামায ফারসি শব্দ। এর আরবি হলো ‘সালাত’। নামায বা সালাত কায়ম করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান মুসলমানের জন্য ফরয বা অবশ্যকর্তব্য। এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম দোয়া বা প্রার্থনা।

আল্লাহ্ তা’লা কুরআন করীমে বলেছেন-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

(ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশায় ওয়াল মুনকার)

অর্থ: নিশ্চয় নামায (নামাযীকে) অশ্লীলতা এবং মন্দকাজ হতে মুক্ত করে। (সূরা আনকাবুত: ৪৬)

আমরা সাধারণত ‘নামায পড়ি’ বা ‘নামায পড়া’ বলে থাকি। নামায পড়া কথাটি একদমই সাধারণ কথা যার মধ্যে মনোযোগ থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে। এজন্যই আল্লাহ্ তা’লা কুরআন করীমে বলেছেন, ‘আক্বীমুস সালাত’ অর্থাৎ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর। আল্লাহ্ তা’লা যেভাবে চান সেভাবে নামাযকে প্রতিষ্ঠা করাই হল

‘আক্বীমুস্ সালাত’। আর আল্লাহ্ তা’লা তাঁর এই নামায জগতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহু পূর্ব থেকেই কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এমন কোন নবী-রসূল জগতে আসেন নি যিনি এই নামাযকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করেন নি।

বাজামা’ত নামায পড়ার ফযিলত:

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: বাজামা’ত নামাযের মাঝে যে অধিক সোয়াব রাখা হয়েছে, এর উদ্দেশ্যই হল, মানুষের মাঝে যেন একতা সৃষ্টি হয়। আর এই একতাকে ব্যবহারিক রূপ দেওয়ার জন্য যে নির্দেশনা এবং গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হল, পরস্পরের পদযুগল যেন সমান্তরাল থাকে, কাতার যেন সোজা হয় আর একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যেন দাঁড়ানো হয়। এর অর্থ যেন একজন ব্যক্তির আদেশ বলবৎ রাখা হয় আর একজনের নূর যেন অন্যদের মাঝে সঞ্চারিত হতে পারে। যে আদর্শে আমিত্ত্ব এবং ব্যক্তিস্বার্থ সৃষ্টি হয় এমন আদর্শ যেন সৃষ্টি না হয়।

ভালোভাবে স্মরণ রাখবে! মানুষের মাঝে অন্যের নূর আকর্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে। এই একতা সৃষ্টির জন্য নির্দেশ হল, প্রতিদিন মহল্লার মসজিদের গিয়ে যেন বাজামা’ত নামায আদায় করা হয় আর সপ্তাহের (তথা জুমুআর) নামায যেন শহরের কেন্দ্রে এবং বছরের (তথা ঈদের) নামায যেন ঈদগাহে সকলে একত্রিত হয়ে আদায় করা হয়। এরপর সমস্ত পৃথিবীর মানুষ বছরে একবার যেন বায়তুল্লাহ-তে গিয়ে একত্রিত হয়। এই সকল নির্দেশনার উদ্দেশ্য হল মানুষের মাঝে একতা সৃষ্টি করা। (মালফুয়াত, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৮৭)

নামায প্রতিষ্ঠার আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণের ৭ পর্যায়:

নামায প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণের ৭টি পর্যায় রয়েছে। এগুলো অতিক্রম করার পরই নামায প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালিত হতে পারে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এ সূক্ষ্ম বিষয়কে খুবই উত্তমভাবে বর্ণনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে একটু আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকুন, আমরা এই আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণে কোন পর্যায়ে রয়েছি। কোন স্তরে পৌঁছেছি এবং এখনো আর কতটি স্তর অতিক্রম করার বাকি রয়ে গেছে। তিনি (রা.) বলেন,

নামাযের প্রথম যে স্তর তা হলো, মানুষ যেন রীতিমতো পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। যে মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে এবং এতে কখনো বিরতি দেয় না সে ঈমানের সবচেয়ে ছোট স্তর লাভ করে থাকে।

নামাযের দ্বিতীয় স্তর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যেন সময়মতো আদায় করা হয়। কোন মুসলমান যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মতো আদায় করে তখন সে ঈমানের দ্বিতীয় সিঁড়ির ওপর পদক্ষেপ রেখে থাকে।

নামাযের তৃতীয় স্তর হলো, নামায যেন বা-জামা'ত আদায় করা হয়। বা-জামা'ত নামায আদায় করার মাধ্যমে মানুষ ঈমানের তৃতীয় সিঁড়িতে আহরণ করে থাকে।

নামাযের ৪র্থ স্তর হল, মানুষ নামাযের উদ্দেশ্যাবলি বুঝে নামায আদায় করে। যে ব্যক্তি অনুবাদ জানে না সে যেন অনুবাদ শিখে নামায পড়ে আর যে অনুবাদ জানে সে যেন ধীরে ধীরে নামাজ আদায় করে। অবশেষে সে যেন বুঝে সে সঠিক অর্থে নামায আদায় করছে।

নামাযের ৫ম স্তর হলো, মানুষ যেন নামাযে পুরোপুরি মোহাবিষ্টতা লাভ করে। আর যেভাবে পানিতে ডুব দেওয়া হয় সেভাবে সে যেন নামাযে ডুব দেয়। অবশেষে সে দুটির মাঝে একটি স্থান লাভ করে। হয়ত সে খোদাকে দেখছেন নয় তো এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে নামায পড়ে থাকে যেন খোদা তা'লা তাকে দেখেন।

নামাযের ষষ্ঠ স্তর হলো, নফল অতিরিক্ত নামায যেন পড়া হয়। এ নফল নামাজ আদায়কারী যেন খোদা তা'লার কাছে এটা প্রকাশ করছে, আমি ফরযে তো আদায় করে দিয়েছি কিন্তু এই ফরযে আমি স্বস্তি পাই নি এবং সে বলে, হে খোদা! এসব ফরয সময় ছাড়াও তোমার দরবারে আমি উপস্থিত হওয়ার প্রত্যাশা রাখি।

নামাযের সপ্তম স্থল হল, মানুষ যেন কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং নফলই আদায় না করে এবং রাতের তাহাজ্জুদ নামায ও যেন পড়ে। এই হলো সাতটি স্তরের মাধ্যমে নামায পূর্ণতা লাভ করে থাকে। অতএব এ সাতটি স্তর পুরো করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যকীয়। (তবসীরে কবীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৫-১৩৬)

(১৫ মার্চ, ২০০৮, পাক্ষিক আহমদী পত্রিকা, পৃষ্ঠা: ২১-২২)

মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার ফযিলত:

মহিলাদের জন্য মসজিদে আসা ফরয করা হয় নি কিন্তু নিজেদের তরবিরত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মহিলাদের মসজিদে আসা প্রয়োজন। মসজিদ আল্লাহ তা'লার নির্দেশিত পবিত্র স্থান এবং আল্লাহ তা'লা কাছে সবচাইতে পছন্দের জায়গা হলো মসজিদ। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “আমি কি তোমাদের এমন বস্তুর সন্ধান দেব না, যা দ্বারা আল্লাহ তা'লা গুনাহ মিটিয়ে দেবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন? তা হলো, কষ্টকর অবস্থায়ও পূর্ণরূপে অযু করা, মসজিদের দিকে বেশি পদচারণা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা...”।

(মুসলিম, হাদিস: ২৫১)

জামা'তে নামাজ পড়ার জন্য হেঁটে মসজিদে গেলে ওই ব্যক্তি আল্লাহ্র জিম্মায় থাকে। আবু উমামা আল-বাহেলি (রা.) হতে বর্ণিত— রসূল (সা.) বলেছেন, তিন ধরনের মানুষ মহান আল্লাহ্র জিম্মায় থাকে।

১. যে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়, সে আল্লাহ্র জিম্মায় থাকে। সে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান অথবা নিরাপদে ফিরে এলে তাকে নেকি এবং গনিমতের প্রাপ্য অংশ দান করেন।
২. যে ব্যক্তি জামা'তে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে ধাবিত হয়, সেও আল্লাহ্র জিম্মায় থাকে। এ অবস্থায় সে যদি মারা যায়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাত দান করেন। আর মসজিদ থেকে ফিরে এলে তার প্রাপ্য সওয়াব ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার করেন।
৩. যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে প্রবেশ করার সময় পরিবারের লোকজনকে সালাম দেয়, সেও মহান আল্লাহ্র জিম্মায় থাকে। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস: ১০৯৪)

মসজিদে আসার প্রতিটি পদক্ষেপে সওয়াব। জাবের বিন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত— মসজিদে নববীর আশপাশে কিছু জায়গা খালি হলো। এটা দেখে বনু সালামা মসজিদে নববীর কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ খবর রসূল (সা.) জানতে পারলে তিনি তাদের বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা মসজিদের কাছে চলে আসার ইচ্ছা করছ! তারা বলল, জ্বি হ্যাঁ! আমরা এমনটা ইচ্ছা করেছি। তিনি বলেন, হে বনু সালামা, তোমরা তোমাদের বাড়িতেই থাকো। কেননা এতে (দূরত্বের কারণে) মসজিদে আসতে তোমাদের পদক্ষেপ বৃদ্ধি পাবে এবং তোমাদের পদচিহ্ন (তোমাদের আমলনামায়) লিখিত হবে। তারা বলল, (মসজিদের কাছে) স্থানান্তরিত হওয়া আমাদের আনন্দ দেবে না। (মুসলিম, হাদিস: ৬৬৫)

তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ফজিলত:

এবং তুমি রাত্রে উঠে এর দ্বারা তাহাজ্জুদ আদায় কর, (এটা) তোমার জন্য নফল (অতিরিক্ত ইবাদত)-স্বরূপ, এতে প্রত্যাশা করা যায় যে, তোমার প্রভু তোমাকে এক বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদায় উন্নীত করবেন। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮০)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন— হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, “আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির উপর দয়া প্রদর্শন করবেন, যে গভীর রাতে নফল নামাযের (তাহাজ্জুদ) জন্য উঠে এবং একই কাজের জন্য তার স্ত্রীকেও জাগায়। যদি স্ত্রী গড়িমসি করে তবে তাকে জাগাবার জন্য তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয় এবং আল্লাহ্ সেই

স্ত্রীলোকের উপর দয়া প্রদর্শন করবেন, যে গভীর রাতের নফল নামাযের জন্য জাগে এবং তার স্বামীকেও একই কারণের জন্য জাগায় এবং স্বামী যদি গড়িমসি করে তবে তাকে জাগানোর জন্য মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।” (আবু দাউদ)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত— মহানবী (সা.) বলেছেন, “আমাদের প্রভু-প্রতিপালক প্রতিরাতে নিকটবর্তী আকাশে নেমে আসেন। যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন আল্লাহ্ তা’লা বলেন, কে আছে? যে আমাকে ডাকছে, যাতে আমি তার ডাকে সাড়া দেই। কে আছে? যে আমার কাছে যাচনা করছে, যাতে আমি দান করি। কে আছে? যে আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছে, যাতে আমি তাকে ক্ষমা করে দেই।” (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত)

তাহাজ্জুদ কেবল আধ্যাত্মিক চিকিৎসাই নয়, বরং দৈহিক চিকিৎসাও বটে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, “আমাদের জামা’তের সদস্যদের উচিত, তারা যেন তাহাজ্জুদ নামাযকে আবশ্যিক করে নেয়। যে বেশি পড়তে পারে না, সে কমপক্ষে দুই রাকাতই পড়ে নিক; কেননা এতে সে অবশ্যই দোয়ার সুযোগ লাভ করবে। এ সময়কার দোয়ায় বিশেষ এক প্রভাব ও কার্যকারিতা অন্তর্নিহিত থাকে”। (মালফুয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫)

৩) রোযা:

ইসলামী ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ রোকন সিয়াম বা রোযা পালন। চান্দ্র বছরের নবম মাসের নাম রমযান। রমযান মাসের নাম পূর্বে ছিল ‘নাতেক’ (তফসীর গ্রন্থ ফাতহ আল-কাদীর)। রমযান শব্দটি ‘রময’ মূল ধাতু হতে এসেছে। এর অর্থ পিপাসায় উত্তপ্ত হওয়া। রমযানে কুরআন পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

অর্থ: রমযান সেই মাস যাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে কুরআন। (সূরা আল-বাকার: ১৮৬)

রমযান মাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হলো, এ পবিত্র মাসে কুরআন করীম নাযিল করা হয়েছিল। আর প্রতিবছর এ মাসে জিব্রাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে বছরের অন্যান্য সময়ে এবং পূর্বে যতখানি কুরআন অবতীর্ণ হতো, তা পুনরাবৃত্তি করা হতো। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের শেষ বছরের রমযান মাসে হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাঁর কাছে দু’বার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন করীম আবৃত্তি করেন (বুখারী)। এতে তিনি বুঝতে পারেন, কুরআন করীম নাযিল সমাপ্ত হয়েছে।

প্রথম আশারার দোয়া:

উচ্চারণ: “রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খায়রুর রাহিমীন।” অর্থ: এবং তুমি বল, হে আমার প্রভু! ক্ষমা করো এবং দয়া করো, বস্তুতঃ দয়াকারীদের মধ্যে তুমিই সর্বোত্তম। (সূরা আল-মু'মিনুন: ১১৯)

দ্বিতীয় আশারার দোয়া:

১. উচ্চারণ: “রাব্বানা ফাগফিরলানা যুনুবানা ওয়া কাফির ‘আল্লা সাইয়েআতিনা ওয়াতা ওয়াফফানা মা’আল আবরার।” অর্থ: ...হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করো এবং আমাদের মন্দ কর্মের অনিষ্টসমূহকে আমাদের থেকে দূরীভূত করো এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের সহিত (শামিল করে) মৃত্যু দাও। (সূরা আলে ইমরান: ১৯৪)
২. উচ্চারণ: “আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যাম্বিও ওয়া আতুবু ইলাইহি।” অর্থ: আমি আমার প্রভু আল্লাহর কাছে আমার সমুদয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।

তৃতীয় আশারার দোয়া:

উচ্চারণ: “আল্লাহুমা আখরিজনী মিনান্নার।” অর্থ: “হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করো।” (আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৭৯)

৪) যাকাত:

যাকাতের অর্থ হলো, মাল বা সম্পদের বৃদ্ধি হওয়া এবং সম্পদকে পবিত্র করা। এটি ইসলামের তৃতীয় রোকন বা স্তম্ভ। এটি এরূপ সদকা বা দান- যা ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ে গরীব এবং অভাবীকে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তা’লা কুরআন করীমে বলেছেন—

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

(ওয়ামা আতাইতুম মিন্ যাকাতিন্ তুরীদুনা ওয়াজ্হাল্লাহি ফাউলাইকা হুমুল মুদ’যিফুন)

অর্থ: আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যাকাত হিসেবে যা দাও সেক্ষেত্রে এরাই সেসব লোক, যারা (যাকাতের মাধ্যমে নিজেদের ধনসম্পদ) বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। (সূরা আর-রুম: ৪০)

জামা’তী চাঁদা ও যাকাত সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ সঞ্চিত হলেই বিত্তশালীর জন্য তা থেকে যাকাত দেয়া আবশ্যিক। জামা’তী চাঁদা জামা’তের

ব্যয়নির্বাহ ও প্রয়োজনীয় কাজে খরচ হয়। জামা'তী সিলসিলা বা সংগঠনের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে চাঁদা নিবে অথবা নিবে না। তাই দু'টি বিষয়কে কখনো এক মনে করা উচিত নয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

“লাযেমী (আবশ্যিক) চাঁদা এবং হিস্যায়ে আমদ (ওসীয়াতকারীদের আয়ের অংশবিশেষ) যাকাত হতে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। বস্তুতঃ যাকাত একটি ফরয কাজ। সব রকম চাঁদা দিলেও যাকাত দেয়া অবশ্যকর্তব্য। যাকাতের নিয়ত করে চাঁদা দিলেও যাকাত আলাদাভাবে দিতে হবে।” (মাসায়েলে যাকাত, পৃ. ১০)

৫) হজ্জ:

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। হজ্জের আভিধানিক অর্থ হলো, সংকল্প বা ইচ্ছা করা। ইসলামী পরিভাষায় শরীয়তের যথাযথ বিধান অনুযায়ী কাবা শরীফের যিয়ারতের (দর্শনের) উদ্দেশ্যে গিয়ে নির্ধারিত ইবাদত পালন করাকে হজ্জ বলা হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেছেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

(ওয়ালিল্লাহি আলান্নাসি হিজ্জুল বাইতি মানিস্তাতা'আ ইলাইহি সাবীলা)

অর্থ: কাবাগৃহের হজ্জ সেসব লোকের ওপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যারা সেখানে যাবার সামর্থ্য রাখে। (সূরা আলে ইমরান: ৯৮)

হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, “সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করল না, সে ইহুদী হয়ে মৃত্যুবরণ করল নাকি খ্রিস্টান হয়ে, সে বিষয়ে আমার কোনো পরওয়া নেই।” (তিরমিযী)

আযান এবং আযানের জবাব

আল্লাহ আকবার (৪ বার)। জবাব: আল্লাহ আকবার (৪ বার)।

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (২ বার)। জবাব: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (২ বার)।

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (২ বার)। জবাব: আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (২বার)।

হাইয়া আলাস সালাহ (২ বার)। জবাব: লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (২ বার) (অর্থ: আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো অসৎ কর্ম হতে বিরত থাকা এবং কোনো সৎকাজ করার ক্ষমতা আমাদের নেই)।

হাইয়া আলাল ফালাহ (২ বার)। জবাব: লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (২ বার)।

আল্লাহ্ আকবর (২ বার)। জবাব: আল্লাহ্ আকবর (২ বার)।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১ বার)। জবাব: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (১ বার)

এছাড়া মুয়াযযিন যখন ফজরের আযানে বলবেন, ‘আস্ সালাতু খায়রুম মিনান্ নাওম’ তখন শ্রোতাদেরকে বলতে হবে ‘সাদাকতা ওয়া বারাকতা’। অর্থাৎ আপনি সত্য বলেছেন এবং কল্যাণের কথা বলেছেন।

আল-কুরআনের জানা-অজানা কিছু বিষয়

- ❖ “আমীন” বলতে হবে— (ক) সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে। (খ) সূরা বাকারা ২৮৭ নং আয়াত পাঠ শেষে। (গ) এছাড়াও বিভিন্ন দোয়া সংবলিত আয়াত যখন পাঠ করা হয়। সূরা আল আ’লার ২য় আয়াত— “সাব্বিহ ইসমা রব্বিকাল আ’লা” পাঠ শেষে পড়তে হয়— “সুবহানা রব্বি আল আ’লা”—এর অর্থ পবিত্র আমার রব অতীব উচ্চ।
- ❖ সূরা আল গাশিয়া পাঠ শেষে বলতে হয় “আল্লাহুম্মা হােসবনা হেসাবাইয়াসীরা” অর্থ: হে আল্লাহ্ আমাদের নিকট থেকে সহজ হিসাব নিও।
- ❖ সূরা আত-তীন পাঠ শেষে বলতে হয়— “বালা ওয়া আনা আলা যালিকা মিনাশ শাহেদীন” অর্থ: কেন নয়, আর আমিও এ বিষয়ে স্বাক্ষরিতাদের অন্তর্ভুক্ত।
- ❖ সূরা আন-নাসর আয়াত নং ৪— “ফাসাব্বিহ বিহামদি রব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু” পাঠ শেষে বলতে হয়— “সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ ফিরলি” অর্থ: হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক তুমি পবিত্র, আর প্রশংসা তোমারই, হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করো।
- ❖ জান্নাত সম্বন্ধে বর্ণিত আয়াত পাঠ করলে বলতে হয় “আল্লাহুম্মা আদখিলনি ফি রহমাতিকা।” অর্থ: হে আল্লাহ্ আমাকে তোমার রহমতে প্রবিষ্ট করো।
- ❖ জাহান্নাম সম্বন্ধে বর্ণিত আয়াত পাঠ করলে বলতে হয় “আল্লাহুম্মা লা তুআযযিবনি” অর্থ - হে আল্লাহ্ আমাকে আযাব দিও না।
- ❖ কুরআন করীমে যে স্থানে দরুদ পড়া উত্তম: কুরআন করীমে মহানবী (সা.)-এর নাম (মুহাম্মদ) বরকতপূর্ণ নাম (সূরা আলে ইমরানের ১৪৫, সূরা মুহাম্মদ ৩, সূরা আহযাবের ৪১, সূরা ফাতহা ৩০ নং আয়াতে) এই চার স্থানে বর্ণিত হয়েছে। অতএব এই সকল স্থানে মহানবী (সা.)-এর নাম পড়া অথবা গুনার সময় মন থেকে আন্তরিকতার সাথে দরুদ অর্থাৎ ‘সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ পড়া উত্তম।

- ❖ সূরা আহযাবের ৫৭ নং আয়াত পড়া ও শোনার সময় হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে দরুদ পড়া উত্তম অথবা কমপক্ষে এই দোয়া পড়া উত্তম “আসসালামু আলাইকা আয্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহুমা সাল্লি আঁলা মুহাম্মদ”। অর্থ: হে নবী (সা.) আপনার ওপর শান্তি এবং আল্লাহর আশিস ও কল্যাণ বর্ষিত হোক!
- ❖ সূরা আলে ইমরান ১৯৩ ও ১৯৪ আয়াত পড়ার পর আমরা যা পড়ব তা নীচে দেওয়া হলো। “রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন্নারা ফাকুদ আখযাইতাহু ওয়ামা লিয্যালিমীনা মিন আনসার” অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করিয়েছ, অবশ্যই তাকে তুমি লাঞ্ছিত করেছ। প্রকৃতপক্ষে অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই (সূরা আলে ইমরান: ১৯৩)। (এই আয়াতের উল্লেখিত আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য “আস্তাগফিরুল্লাহ” পড়া উচিত।) “রাব্বানা ইন্নানা সামিনা মুনাদিয়াইয়্যুনাদী লিলঈমানি আন আমিনু বিরাক্বিকুম ফা আমান্না” (সূরা আলে ইমরান : ১৯৪)। অর্থ: হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে (এই বলে) আহ্বান জানাতে শুনেছি- তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। অতএব আমরা ঈমান এনেছি। (এই আয়াতের অংশ পড়ে কৃতজ্ঞতার সাথে “আলহামদুলিল্লাহ” পড়া উচিত।)
- আয়াতের দ্বিতীয় অংশে, রাব্বানা ফাগফিরলানা য়ুনুবানা ওয়া কাফফির আন্না সায্যিআতিনা ওয়া তাওয়াফফানা মাআল আবরার (সূরা আলে ইমরান: ১৯৪)। অর্থ: অতএব হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের দোষত্রুটি আমাদের কাছ থেকে দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে মৃত্যু দাও। (এই আয়াত পড়ে দোয়ার কবুলিয়তের জন্য আমীন পড়া উচিত।)
- ❖ সূরা আলে-ইমরান এর ‘শাহিদাল্লাহু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, ওয়াল মালাইকাতু ওয়া উলুল ঈলমি কায়িমাম বিলকিসত’ (সূরা আলে ইমরান: ১৯)। অর্থাৎ আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ছাড়া ভিন্ন কোনো উপাস্য নেই। আর ফিরিশতারা এবং জ্ঞানীরাও সদা সত্য ও ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত থেকে এ সাক্ষ্যই দেয় যে, তিনি ছাড়া ভিন্ন কোনো উপাস্য নেই। এই আয়াতের জবাবে এই দোয়া পড়া উত্তম “ওয়া আনা আশহাদু বিহী” অর্থাৎ আমিও এই একই সাক্ষ্য দিচ্ছি।

- ❖ সূরা বনী ইসরাঈল-এর শেষে ‘ওয়া কাবিরহু তাকবীরা’ অর্থাৎ তুমি আল্লাহ তা’লার মাহাত্ম্য বা গৌরব (অতি উত্তমরূপে) বর্ণনা কর। এই আয়াতাংশ পড়া বা শোনা হয় তখন এর জবাবে ‘আল্লাহু আকবার’ বলতে হয় অর্থাৎ আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো।
- ❖ সূরা কিয়ামা-এর সর্বশেষ এই আয়াত “আলাইসা যালিকা বিকাদিরীন আ’লা আইয়ুহইল মাওতা” অর্থাৎ তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন? (সূরা কিয়ামা: ৪১) পড়ার পর পড়বে ‘বালা’ অর্থাৎ কেন নয়। আল্লাহ তা’লা অবশ্যই এই বিষয়ে সর্বশক্তিমান।
- ❖ সূরা মুরসালাত-এর এই আয়াত “ফাবিআয়্যি হাদীসিন বাদাহু ইউ’মিনূন” অর্থাৎ এরপর তারা আর কোন কথার প্রতি ঈমান আনবে? (সূরা মুরসালাত: ৫১) পাঠ করার পর ‘আমান্না বিল্লাহি’ বলবে। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ তা’লার প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম।” (আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাব মিকদারুর রুকু ওয়াস সুজুদ)
- ❖ সূরা মুলক-এর “কুল আরাআইতুম... ইয়াতিকুম বিমায়িম মায়ীন” অর্থাৎ তুমি বলো, তোমাদের (সব) পানি অনেক গভীরে নেমে গেলে বলো দেখি, কে তোমাদের জন্য (স্বচ্ছ) বহমান পানি এনে দিবেন? (সূরা মুলক: ৩১) এই আয়াত পাঠ অথবা শ্রবণকারীর এই দোয়া পড়া উত্তম “আল্লাহু ইয়া’তিইনা বিহী ওয়া হুয়া রাব্বুল আ’লামীন” অর্থাৎ আমাদের প্রভু-প্রতিপালকই একে আমাদের নিকট নিয়ে আসবেন আর তিনিই এই বিশ্ব জগতের প্রতিপালক-প্রভু।
- ❖ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা’লা ইসতেগফার বা ক্ষমা লাভের জন্য দোয়া চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, সূরা বাকারা: ২০০, সূরা নিসা: ১০৭, সূরা হূদ: ৫৩ ইত্যাদি। উল্লিখিত আয়াতসমূহ পাঠ অথবা শোনার পর ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ পাঠ করা উত্তম। অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহ তা’লার নিকট (আমার সমুদয় পাপ থেকে) ক্ষমা প্রার্থনা করছি।
- ❖ সূরা আশ-শামস-এর ফাআলহামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাকওয়াহা অর্থাৎ কেননা তিনি এ (আত্মার) প্রকৃতিতে (এর জন্য) ভালোমন্দ (বিচার করার যোগ্যতা) প্রোথিত করে দিয়েছেন (আশ-শামস: ৯)। এই আয়াত পাঠ অথবা শোনার পর এই দোয়া পড়া উত্তম। অর্থাৎ আল্লাহুমা আতি নাফসী তাকওয়াহা ওয়া যাক্বাহা আনতা খাইরুম মান যাক্বাহা আনতা ওয়ালিয়ুহা ওয়া মাওলাহা অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক-প্রভু! তুমি আমার আত্মাকে ভালোমন্দ (বিচার করার যোগ্যতা) দান করো এবং একে পবিত্র করে দাও কেননা, তুমিই এর উত্তম পরিশুদ্ধকারী আর তুমিই এর প্রকৃত অভিভাবক এবং প্রভু।

❖ হযরত মা'কেল (মা'কাল নহে) বিন ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেছেন- হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি সকালে উঠে তিনবার বলবে- আউজুবিল্লাহিস সামীয়িল আলীম মিনাশ শায়তানির রাজীম অতঃপর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ তা'লা তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা নিযুক্ত করবেন। যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবেন। আর যদি মারা যায়, মারা যাবে শহীদরূপে এবং যে ব্যক্তি তা সন্ধ্যায় পড়বে; সে-ও হবে অনুরূপ মর্তবার অধিকারী।” (তিরমিযী-দারেমী)

সূরা আল-ফাতেহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ফজিলত:

আল-কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা আল-ফাতেহা। ফাতেহা শব্দের অর্থ ভূমিকা, মুখবন্ধ, দ্বার উন্মোচনকারী ইত্যাদি। যেহেতু এ সূরার মাধ্যমে কুরআনুল করিম শুরু করা হয়, সেজন্য এ সূরার নাম আল-ফাতিহা। একে ফাতেহাতুল কিতাব বা ফাতেহাতুল কুরআনও বলা হয়। অর্থাৎ কিতাব বা কুরআনের ভূমিকা।

সূরা ফাতিহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমার্ধে আল্লাহ সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয়ার্ধে মানুষ (বান্দা) সম্পর্কিত। এ সূরাটি মক্কি সূরা। এর আয়াত সংখ্যা সর্বমোট ৭টি। এই সূরার আরও অনেক নাম রয়েছে, তন্মধ্যে ১০টি অধিক প্রমাণসিদ্ধ, যেমন, আল ফাতেহা বা ফাতেহাতুল কিতাব (ঐশী) কিতাবের উদ্বোধনী সূরা), আস-সালাত (নামায), আল-হামদ (প্রশংসা), উম্মুল কুরআন (কুরআন জননী), আল-কুরআনুল আযীম (মহা কুরআন), আস-সাবউল মাসানী (পুনঃ পুন পাঠ্য সাত আয়াত), উন্মুল কিতাব (কিতাব জননী), আশ-শিফা (আরোগ্য), আর রুকইয়া (পড়িয়া ফুঁ দেবার সূরা) এবং আল-কানয (ভাণ্ডার)।

সূরাতুল হামদ (প্রশংসার সূরা)। এ সূরায় আল্লাহ তা'লার প্রশংসা করা হয়েছে।

উম্মুল কুরআন (কুরআনের জননী); এ সূরা পবিত্র কুরআনের সারসংক্ষেপ, যাতে সংক্ষিপ্তাকারে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির শিক্ষাসমূহ বিদ্যমান।

সূরাতুস সালাত (সালাতের সূরা): সালাতের শুরুতে এ সূরা পাঠ করা অপরিহার্য। এ সূরা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না।

সূরাতুশ শিফা (রোগমুক্তির সূরা): এ সূরার মাধ্যমে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

সূরাতুদ দোয়া (দোয়া বা প্রার্থনামূলক সূরা): এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা নিবেদন করা হয়।

সূরাতুল ফাতিহাকে রসূল করীম (সা.) শ্রেষ্ঠ দোয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
(মুস্তাদরাক হাকিম)।

আয়াতুল কুরসী পাঠের ফযিলত:

হাদীসে আয়াতুল কুরসীর বহু ফযিলত উল্লিখিত হয়েছে, প্রকৃত প্রস্তাবে আয়াতটি কুরআনের ছয় সহস্রাধিক আয়াতের মধ্যে সর্ববৃহৎ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এটিকে সবার চেয়ে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, “যে লোক প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করে তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো অন্তরায় থাকে না। অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথে সে বেহেশতের ফলাফল এবং আরাম আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করে। (নাসায়ী শরীফ)

সূরা আর-রহমান পড়ার ফজিলত:

সূরা আর রহমান-কে “উরুসুল কুরআন” বা কুরআনের নববধূ বলা হয়। এই সূরাতে মোট ৩১ স্থানে ‘ফাবিআয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাযযিবান’ এই আয়াত আছে। এই আয়াতের অর্থ: অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালক-প্রভুর! কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? স্থান-কালভেদে বার বার এই আয়াতের ব্যবহার পাঠকারীর ওপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। এই আয়াতসমূহ পাঠ বা শোনার পর এর জবাবে যে দোয়া পড়া উত্তম তা স্বয়ং মহানবী (সা.) শিখিয়েছেন।

হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীস, তিনি (রা.) বলেন, একবার মহানবী (সা.) সাহাবীদের নিকট আসার পর তাঁর (সা.)-এর সামনে সূরা আর-রহমান এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হলে সাহাবারা নীরব থাকেন। এতে মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে বলেন, আমি যখন জিনদের সামনে এই সূরা তেলাওয়াত করেছিলাম তখন তারা তোমাদের থেকেও এর ভালো প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। আমি যখনই ‘ফাবিআয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাযযিবান’ এই - আয়াত পাঠ করতাম তখন তারা (জিনরা) বলত “লা বিশাইয়িম মিন নিয়ামিকা রাব্বানা নুকাযযিবু ফালাকাল হামদ” অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! আমরা তোমার কোন নেয়ামত বা অনুগ্রহরাজিকেই অস্বীকার করি না এবং সমস্ত প্রশংসা কেবল তোমারই। (জামে তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর, সূরা আর-রহমান)

সূরা আল ওয়াকে'আ পড়ার ফজিলত:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ(সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি প্রতিদিন রাতে সূরা আল ওয়াকে'আ তিলাওয়াত করবে তাকে কখনো দরিদ্রতা স্পর্শ করবে না।” এজন্য এই সূরাটিকে সূরা গনি বা ধন লাভের সূরা-ও বলা হয়। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) তাঁর মেয়েদেরকে প্রত্যেক রাতে এ সূরা তিলাওয়াত করার আদেশ করতেন। (বায়হাকি)

সূরা আল ওয়াকে'আ এর উল্লেখিত আয়াত তেলাওয়াত সময় এর জবাবে যে বাক্যসমূহ পাঠ করা উত্তম তা হলো— সূরা আল ওয়াকে'আ এর ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৩ নম্বর আয়াতের জবাবে বা তেলাওয়াত করার পর ‘বাল আনতা ইয়া রাক্বি’ এই দোয়া পড়া উত্তম। অর্থ: হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমিই এই কাজ কর। সূরা আল ওয়াকে'আ এর ৭৫ ও ৯৭ নং আয়াতের জবাবেও বা তেলাওয়াত করার পর “সুবহানা রাক্বিয়াল আ'যীম” পড়া উত্তম। অর্থ: পবিত্র আমার প্রভু প্রতিপালক! যিনি অতিব মহান।

সূরা ইয়াসীন পড়ার ফজিলত:

ওয়াকফে গুফরান পড়ার নিয়ম— কুরআন পড়ার সময় (ওয়াকফে গুফরান) এইরূপ চিহ্নিত স্থানে থামিলে পাপ ক্ষমা হয়। সূরা ইয়াসীন এর ১৩, ৩১, ৫৩, ৬২, ৮২ নম্বর আয়াতে (ওয়াকফে গুফরান) চিহ্নটি আছে। এই চিহ্নিত আয়াতে থেমে আল্লাহর কাছে নিজের পাপ ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'লা ক্ষমা করে দেন। সূরা ইয়াসীন এর আয়াত ৮৪ টি। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘প্রত্যেক বস্তুরই একটা হৃদয় থাকে আর কুরআনের হৃদয় হল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন একবার পড়বে, মহান আল্লাহ তাকে দশবার পুরো কুরআন পড়ার সওয়াব দান করবেন।’ (তিরমিযি)

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেছেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তা'লা তার বিগত জীবনের সব গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। (বায়হাকি, আবু দাউদ)

(উপরের পবিত্র কুরআন থেকে নেওয়া সকল বিষয়গুলোর তথ্যসূত্র: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৯ এপ্রিল ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে জহীর আহমদ তাহের ইবনে নযীর আহমদ খাদেম-জার্মানি কর্তৃক প্রকাশিত ‘কুরআন তেলাওয়াতের আদব’ বিষয়ে লিখিত তৃতীয় ও শেষ কিত্তি)

সূরা লুকমানে ছেলের প্রতি লুকমান (আ.)-এর উপদেশ:

সূরা লুকমান কুরআনের ৩১ নম্বর সূরা, এতে হযরত লুকমান (আ.)-এর জ্ঞান ও উপদেশের কিছু অংশ তার ছেলেকে উদ্দেশ্যে করে বর্ণিত হয়েছে। এই উপদেশগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয়, যা একজন সন্তান বা তরুনকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য আদর্শ দিকনির্দেশনা দেয়।

১. “হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি আল্লাহর সহিত কাউকেও শরীক কোরো না। নিশ্চয় শিরক অতি ভয়ানক যুলুম।” (আয়াত ১৪)
২. পিতামাতার সাথে সদাচরণের তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছি। সুতরাং আমার এবং তোমার পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো; (আয়াত ১৫)
৩. আল্লাহ সবকিছু জানেন, তাই গোপন কিছু করলেও তা তিনি জানেন- “হে আমার সন্তান! যদি কোনো বস্তু সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা কোনো পাথরের মধ্যে কিংবা আকাশে বা মাটির নিচে থাকে, আল্লাহ তা বের করে আনবেন।” (আয়াত ১৭)
৪. “হে আমার প্রিয় পুত্র! নামায কয়েম করো।” (আয়াত ১৮)
৫. (লোকদেরকে) সৎ কর্মের উপদেশ দাও এবং অসৎকর্ম হতে বিরত রেখো। (আয়াত ১৮)
৬. এবং তুমি কোনো ক্রেশে (কষ্টে) পতিত হলে তাতে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় এটি অত্যন্ত দৃঢ় সংকল্পের কাজ।” (আয়াত ১৮)
৭. তুমি লোকের সম্মুখে অজ্ঞতাভরে নিজের গাল ফুলিও না, ... (আয়াত ১৯)
৮. “এবং ভূপৃষ্ঠে অহংকারের সাথে চলো না- কোন দাস্তিক, অহংকারীকে আল্লাহ আদৌ ভালোবাসেন না”। (আয়াত ১৯)
৯. “তুমি নিজ চালচলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো।” (আয়াত ২০)
১০. “নিজ কণ্ঠস্বরকে মৃদু রাখো, নিশ্চয় সকল কণ্ঠস্বরের মধ্যে গর্দভের কণ্ঠস্বর হলো সর্বাধিক কর্কশ।” (আয়াত ২০)

সূরা আল-হুজুরাত থেকে কয়েকটি উপদেশ:

- ১। উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলা। (আয়াত ৩-৪)
- ২। ফাসিকের কথার সত্যতা যাচাই ব্যতীত বিশ্বাস করো না। (আয়াত ৭)
- ৩। বিবাদমান দুটি পক্ষের ঝামেলা ন্যায়পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করে দিও। (আয়াত ১০)

- ৪। কাউকে উপহাস কোরো না (আয়াত ১২)
- ৫। তোমরা নিজেদের লোকদের অপবাদ দিও না বা দোষারোপ কোরো না (আয়াত ১২)
- ৬। মন্দ নামে বা নাম বিকৃত করে তোমরা একে অন্যকে ডেকো না (আয়াত ১২)
- ৭। তোমরা বার বার সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকো। (আয়াত ১৩)
- ৮। (কারো ওপর) গোয়েন্দাগিরি কোরো না। (আয়াত ১৩)
- ৯। একে অন্যের পশ্চাতে গীবত অর্থাৎ কুৎসা কোরো না। (আয়াত ১৩)

সূরা আল-কাহফ তিলাওয়াতের গুরুত্ব:

যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহফ তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'লা এ জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত তার জন্য নূরের আলো দ্বারা আলোকিত করে রাখবে। যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফেতনা হতে রক্ষা পাবে। (মুসলিম: ৮০৯; আবু দাউদ: ৪৩২৩)

ঋতুশ্রাবকালীন সময়ে মহিলাদের কুরআন পাঠ:

(মাসিকের) বিশেষ দিনগুলোতে মহিলাদের পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা, পাঠ করা এবং কম্পিউটার অথবা আই প্যাড ইত্যাদি দেখে কুরআন পাঠ করা সম্পর্কে এক ব্যক্তি বিভিন্ন আলেম-ওলামা ও ফিকাহবীদদের উদ্ধৃতির আলোকে একটি গবেষণা হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে প্রেরণ করে এই মাসলার ব্যাপারে তাঁর কাছে নির্দেশনা কামনা করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের পত্রে এর নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

হুযূর উত্তরে বলেন, “এ বিষয়ে ওলামা এবং ফিকাহবীদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে আর ধর্ম-বিশারদরাও নিজেদের কুরআনের জ্ঞান বা ব্যুৎপত্তি মোতাবেক এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অমৃতবাণীর আলোকে এ সম্পর্কে আমার মতামত হলো, ঋতুশ্রাবের দিনগুলোতে মহিলাদের পবিত্র কুরআনের যেসব অংশ মুখস্থ আছে তা তারা যিকর ও আযকার হিসেবে মনে মনে পুনরাবৃত্তি করতে পারে। এছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে... কোনো পরিষ্কার কাপড় দিয়ে পবিত্র কুরআন স্পর্শও করতে পারে এবং কাউকে উদ্ধৃতি ইত্যাদি বলার জন্য অথবা বাচ্চাদের কুরআন পড়ানোর জন্য কুরআনের কোনো অংশ পড়তেও পারে, কিন্তু (সাধারণ দিনের মতো) রীতিমত কুরআন পাঠ করতে পারবে না। একইভাবে এদিনগুলোতে মহিলাদের কম্পিউটার ইত্যাদিতেও যেখানে বাহ্যত তাকে

কুরআন স্পর্শ করতে হয় না- রীতিমত কুরআন পড়ার অনুমতি নেই, কিন্তু বিশেষ কোনো প্রয়োজনে, অর্থাৎ উদ্ধৃতি খুঁজে বের করার জন্য অথবা কাউকে কোনো উদ্ধৃতি দেখানোর জন্য কম্পিউটার ইত্যাদির মাধ্যমে পবিত্র কুরআন থেকে লাভবান হতে পারে। এতে কোনো সমস্যা নাই। (তথ্যসূত্র: ১৫ জানুয়ারি, ২০২৩ পাক্ষিক আহমদী)

কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় আয়াত

- ❖ শোন! আল্লাহ্র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। (সূরা রাদ: ২৯)
- ❖ ...স্মরণ রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ্র সাহায্য সন্নিবর্তিত। (সূরা আল-বাকারার: ২১৫)
- ❖ নিশ্চয় কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। (সূরা ইনশিরাহ: ৭)
- ❖ এবং তুমি স্মরণ করো তোমার প্রভুকে নিজ অন্তরে কাকুতি মিনতি ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চস্বরে, প্রাতে ও সন্ধ্যায়...। (সূরা আল-আরাফ: ২০৬)
- ❖ ...আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্র রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না। (সূরা ইউসুফ: ৮৭)
- ❖ আল্লাহ্ কোনো ব্যক্তির উপর তার সাধের চেয়ে বেশি বোঝা চাপিয়ে দেন না...। (সূরা আল-বাকারার: ২৮৭)
- ❖ এবং অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, প্রাণসমূহ এবং ফল ফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করব এবং তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। (সূরা আল-বাকারার: ১৫৬)
- ❖ ...হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্যপ্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (সূরা আল-বাকারার: ১৫৪)
- ❖ ...অবশ্যই ভালো কাজসমূহ মুছে ফেলে মন্দ কাজ সমূহকে...। (সূরা হুদ: ১১৫)
- ❖ ...যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর তবে তোমাদেরকে আরো দিব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি হবে কঠোর”। (সূরা ইব্রাহীম: ৮)
- ❖ যখন তুমি দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা করবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান: ১৬০)
- ❖ যে আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করে তিনি তার জন্য কোনো না কোনো উদ্ধারের পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।” (সূরা আত-তালাক: ৩-৪)

- ❖ যারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে তাদের দৃষ্টান্ত এক শস্য বীজের দৃষ্টান্তের ন্যায় যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্য বীজ থাকে এবং আল্লাহ যার জন্য চান (তা অপেক্ষাও) বৃদ্ধি করে দেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যাদানকারী, সর্ব জ্ঞানী।” (সূরা আল-বাকার: ২৬২)
- ❖ তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী! (সূরা হজ্জ: ৭৯)
- ❖ নিশ্চয় আল্লাহ ধোঁকাবাজ প্রতারককে পছন্দ করেন না। (সূরা আল-আনফাল: ৫৯)
- ❖ মানুষ নিরাশ হয়ে যাবার পরে তিনি বৃষ্টিবর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই কার্যনির্বাহী, প্রশংসিত। (সূরা আশ-শুরা: ২৯)
- ❖ অতপর যখন তোমরা নামায শেষ কর, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিকির কর। (সূরা আন-নিসা: ১০৪)
- ❖ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। (সূরা আল-মুমিন: ৬১)
- ❖ নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (সূরা আলে ইমরান: ১০)
- ❖ রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মুখরী কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, ‘সালাম’। (সূরা ফুরকান: ৬৪)
- ❖ যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছি। অতএব তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর, এবং আগুনের আযাব হতে আমাদেরকে রক্ষা কর; যারা ধৈর্যশীল, এবং সত্যবাদী, এবং অনুগত, এবং (আল্লাহ পথে স্বীয় ধনসম্পদ) ব্যয়কারী এবং রাতের শেষভাগে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী। (সূরা আলে ইমরান: ১৭-১৮)
- ❖ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে রহমত দান কর। নিশ্চয় তুমি মহান দাতা। (সূরা আলে ইমরান: ৯)

গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাদীস

- ❖ সাত ব্যক্তি হাশরের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে: আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত- নবী করীম (সা.) বলেছেন, যেদিন আল্লাহর (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা’লা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন- (১) ন্যায়পরায়ন শাসক। (২) সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে। (৩) সে ব্যক্তি যার অন্তর

মজসিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। (৪) সে দুই ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালোবাসে আল্লাহর জন্য, একত্র হয় আল্লাহর জন্য, এবং পৃথক-ও হয় আল্লাহর জন্য। (৫) সে ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহ্বান জানায়, কিন্তু সে বলে প্রত্যাখান করে যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৬) সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করেন যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না। (৭) সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর জিকির (স্মরণ) করে, ফলে তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং-৬৬০)

- ❖ তোমাদের প্রত্যেকের উচিত এক টুকরা খেজুর (সাদাকাহ) দিয়ে হলেও আগুন (জাহান্নামের) হতে আত্মরক্ষা করা, না পারলে উত্তম কথা দিয়ে হলেও (বুখারী) একদিন এক সাহাবী নবীজি (সা.) এর দরবারে এসে বিনয়ের সঙ্গে বললেন ইয়া রসূলুল্লাহ আমার কাছে দান করার মতো কিছু নেই আমি আল্লাহর পথে কিছু দান করতে চাই, তখন নবী করীম (সা.) বললেন, প্রত্যেক সৎ কাজই সাদাকা-হাসিমুখে কারও সঙ্গে কথা বলা সাদাকা, ভালো কথা বলা সাদাকা, অন্যকে ভালো উপদেশ দেয়া সাদাকা, এমনকি কারো জন্য দোয়া করা সাদাকা। (সহিহ মুসলিম)
- ❖ রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি নিজের অবসর সময় তৈরি কর ও ইবাদতে মন দাও। তাহলে তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার দারিদ্রতা ঘুচিয়ে দেব। যদি তা না কর, তাহলে তোমার হাতকে কর্মব্যস্ততায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব কখনোই দূর করব না।” (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)
- ❖ রাসূলে করীম (সা.) বলেন, তুমি যেখানে থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক মন্দ কাজের পর ভালো কাজ কর যা তাকে (মন্দ কাজসমূহকে) মুছে দিবে। আর মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার কর। (তিরমিযী)

রুহানী খাযায়েন

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশনা

- ❖ প্রত্যেক ব্যভিচারী, পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়াড়ি, বিশ্বাসঘাতক, ঘুষখোর আত্মসাৎকারী, অত্যাচারী, মিথ্যা অপবাদ লেগে থাকে এবং নিজেদের কুকর্ম হতে তওবা করে না ও কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তারা আমার জামা'তভুক্ত নয়।
- ❖ সে ব্যক্তি দৈনিক নিষ্ঠার সাথে পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ে না, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।

- ❖ যে ব্যক্তি সর্বদা দোয়াতে রত থাকে না এবং অতি বিনয়ের সাথে খোদাকে স্মরণ করে না, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।
- ❖ সেই ব্যক্তি, যে ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপরে স্থান দেয় না, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।
- ❖ যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং প্রতারণা পরিত্যাগ করে না সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।
- ❖ যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে নম্রতা ও ভদ্রতার ব্যবহার করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়।
- ❖ যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীর সাথে সামান্য ব্যাপারেও সদ্ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয়, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়।
- ❖ যে স্বামী, স্ত্রীর সাথে এবং যে স্ত্রী, স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।
- ❖ যে ব্যক্তি অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয় এবং বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।
- ❖ যে ব্যক্তি কুপ্রভাব বিস্তারকারী কুসঙ্গী পরিত্যাগ করে না, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।
- ❖ যে ব্যক্তি পিতামাতার সম্মান করে না এবং সেই সমস্ত ন্যায়-সঙ্গত বিষয়ে যা কুরআনের বিরুদ্ধে নয়, তাদের আদেশ পালন করে না এবং তাদের খেদমতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।
- ❖ যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গীকারকে যা বয়আত করার সময় করেছিল কোন অংশে ভঙ্গ করে, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।
- ❖ যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং প্রতিশ্রুত মাহদী বলে বিশ্বাস করে না, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।

(তথ্যসূত্র: কিশতিয়ে নূহ)

- ❖ ১৯৯৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই ইলহামী দোয়াটি অধিক পরিমাণে পাঠ করার জন্য তাহরীক করেন। আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহহিকহুম তাহসিকাহ অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি তাদেরকে (আহমদীয়া জামা'তের শত্রুদের) সম্পূর্ণভাবে টুকরো টুকরো কর এবং তাদের সমূলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও।

ইসলামের কিছু আদব-কায়দা

- ১। কোনোকিছু গুরু করার আগে বলতে হয়- ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’
অর্থ: আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যিনি অযাচিত অসীমদাতা বারবার কৃপাকারী।
- ২। কারো সাথে দেখা হলে সম্ভাষণ করার সময় বলতে হয়- ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু’ অর্থ: আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

সুননত অনুযায়ী সালাম: একবার এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম (সা.) এর দরবারে এলেন ও বললেন, “আসসালামু আলাইকুম” (আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!) হযূর (সা.) “ওয়া আলাইকুমুস সালাম” (তোমার ওপর ও শান্তি বর্ষিত হোক) বললেন। এরপর বললেন, এ ব্যক্তি দশটি পুণ্য পাবে। আরেকজন এলেন ও বললেন “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” (আপনার ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)। হযূর (সা.) উত্তর দেবার পর বললেন, এ ব্যক্তি বিশটি পুণ্য পাবে। তৃতীয় আরেকজন এলেন এবং বললেন “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু” (আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক)। হযূর (সা.) উত্তর দেবার পর বললেন, এ ব্যক্তি ত্রিশটি পুণ্য পাবে। বুঝা গেল নিজ ভাইয়ের জন্য যত অধিক ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সাথে দোয়া করা যায় তত বেশি পুণ্য লাভ হয়। (তথ্যসূত্র: দোয়াইয়্যাখ খাযায়েন বই)
- ৩। ভালো কিছু পেলে বা কোনোকিছু শেষ হলে বলতে হয় ‘আলহামদুলিল্লাহ’।
অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর।
- ৪। কেউ কিছু দিলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গেলে বলতে হয় ‘জাযাকুমুল্লাহ’।
অর্থ: আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।
- ৫। কোনোকিছু আশা করলে বা কোন পরিকল্পনা করলে বলতে হয় ‘ইনশাআল্লাহ’। অর্থ: যদি আল্লাহ চান।
- ৬। যখন ভালো বা সুন্দর কিছু দেখি তখন বলতে হয় ‘মাশাআল্লাহ’। অর্থ: আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে।
- ৭। হযরত (সা.) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি হাঁচি দেয় সে যেন “আলহামদুলিল্লাহ” (সব প্রশংসা আল্লাহর) বলে। আর যে শোনে সে যেন

“ইয়ারহামুকাল্লাহ্” (আল্লাহ্ তোমার প্রতি করুণা করুন) বলে। এ দোয়া শুনার পর হাঁচিদাতা “ইয়াহদীকুমুল্লাহ্ ওয়া ইউসলিহ্ বালাকুম” (আল্লাহ্ তোমাকে পথপ্রদর্শন করুন ও তোমার অবস্থা শুধরে দিন)।

হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বলেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, “একে অপরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, অযথা মূল্য বৃদ্ধি করো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না। তোমরা একে অপরের সওদার ওপর সওদা করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই-ভাই হও। মুসলমানগণ পরস্পর ভাই-ভাই এবং সে যেন তার ওপর নির্যাতন না করে এবং তাকে অপদস্থ না করে। মহানবী (সা.) নিজ বক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিন বার বললেন, “এইখানে তাকওয়া (খোদাভীতি)।” অতঃপর তিনি আরও বলেন, “কারো নিজ মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করাই তার অনিষ্টের জন্য যথেষ্ট। একজন মুসলমানের অর্থ, সম্পত্তি এবং সম্মান অপর মুসলমানের কাছে অবৈধ।” (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াসসালাহ)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বর্ণনা করেছেন, “হিংসা থেকে সাবধান থেকো। কারণ আগুন যেভাবে কাঠ ও খড়কে ভক্ষণ করে ঠিক সেইভাবেই হিংসা পুণ্যকে ভক্ষণ করে ফেলে।” (আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক পাঠের ফজিলত

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ২৭ ডিসেম্বর ১৯২০ সালানা জলসায় বলেন, তোমরা অবশ্যই অন্যান্য বিষয়ে লেখাপড়া করো কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞান অবশ্যই অর্জন করো এবং নিজের ভিতরে ধর্মীয় বিষয়াবলি বুঝার ও গ্রহণ করার ক্ষমতা সৃষ্টি করো। সেটার জন্য প্রথমে কুরআন শেখো, দ্বিতীয়ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পুস্তক পাঠ করো। অবশ্যই মনে রাখবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পুস্তকসমূহ কুরআনের তফসীর। প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ পাতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পুস্তক পড়ার কথা বলা হয়েছে। তারপর আরো বই যখন পড়া শুরু করবে তখন আল্লাহর ফজল ও রহমত বর্ষিত হতে থাকবে। তার বইয়ে সমস্ত বিশ্বাসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যারা একটু মনোযোগী তারাই পৃথিবীর জন্য আদর্শ ও পথপ্রদর্শক হয়ে যাবেন এবং খোদার কল্যাণ

লাভ করতে থাকবেন। সুতরাং এই আধ্যাত্মিক খাবারের মূল্যায়ণ করে তা থেকে কল্যাণ লাভ করা উচিত। যদি কেউ ছাত্র হোন তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বই পড়ার কারণে তার ব্রেনে, মসৃণতার সৃষ্টি হবে আর তার ভিতরে জ্যোতির সৃষ্টি হবে। অতঃপর সে অন্যান্য বিষয়ে ভালো বুঝতে পারবে। সুতরাং প্রতিটি আবাল বৃদ্ধ বণিতার জন্য এটা আবশ্যকীয় যে তারা যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বই পাঠ করে জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে নিজেদের হৃদয় ও মস্তিষ্কে আলো ও জ্যোতি পৌঁছায়।

ফিরিশতাগণের অবতীর্ণ হওয়া: হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, “যে পুস্তকসমূহ একজন এমন ব্যক্তি লিখেছেন যার ওপর ফেরেস্তা অবতীর্ণ হত সেটাকে পাঠ করলেও ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি হযরত সাহেবের পুস্তকসমূহ পাঠ করবে, তো তার উপরও ফেরেস্তা অবতীর্ণ হবে।” (মালায়েকাতুল্লাহ)

কেননা বর্তমান যুগে জ্ঞান লাভের আর কুরআনকে বোঝার রসূল করীমের হাদীসসমূহের মর্মার্থ উপলব্ধি করার একমাত্র মাধ্যমই হচ্ছে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকসমূহ পাঠ করা। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এর গুরুত্ব বুঝার তৌফিক দান করুন, আমীন। (সংগৃহীত)

৭০ লাইন কাসিদা মুখস্থ করার ফজিলত: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন এই কাসিদা লিখা শেষ করলেন তখন তাঁর উপর ইলহাম করে আল্লাহ্ তা'লা জানালেন, যে এই কাসিদা মুখস্থ করবে তার হৃদয়ে আল্লাহ্র ভালোবাসা ও তাঁর রসূলের ভালোবাসা আল্লাহ্ তা'লা ঠেসে ঠেসে ভরে দিবেন এবং তাঁর স্মরণ শক্তি বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়া হবে। (তথ্যসূত্র: লাজনা ইমাইল্লাহ সিলেবাস)

ঈমান উদ্দীপক ঘটনা: মোবারক আহমদ নাজির মিশনারী ইনচার্জ কানাডা। তিনি বলেন, আমি রসায়নে অনেক দুর্বল ছিলাম। তাই দোয়ার জন্য মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেবের কাছে যাই। তিনি আমাকে বলেন, বেশী বেশী দুরূদ পড় আর মসীহ্ মাওউদের আরবী কাসিদা মুখস্থ করো। সবার অবগতির জন্য বলছি, আরবী কাসিদা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সানে রচিত। তিনি বলেন, আমি তাই করলাম এবং পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করলাম। তিনি বলেন আরবী কাসিদা পড়ে আমার তিনটি দিক ভালো হয়েছে। (১) রসূলকে ভালোবাসতে শিখলাম (২) মেধার উন্নতি হয়েছে ও (৩) ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করতে পারলাম। (তথ্যসূত্র: পাক্ষিক আহমদীয়া ১৫ জুলাই ২০১৮)

খিলাফত এবং জুমুআর খুতবা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পাঁচ খলিফার নাম, খিলাফতকাল এবং পদবী এবং তাঁর খলীফাদের নামের শব্দার্থ:

- ১। আলাইহেস সালাম (আ.) অর্থ - তাঁর প্রতি সালাম এবং শান্তি বর্ষিত হোক।
- ২। হযরত অর্থ- মাননীয়, মহামান্য।
- ৩। ইমাম মাহদী অর্থ - হেদায়েত প্রাপ্ত ধর্মীয় নেতা।
- ৪। আহমদ অর্থ- সর্বাপেক্ষা প্রশংসাকারী।
- ৫। মির্যা অর্থ - “তাঁর বংশগত উপাধি”(মীরযাদা, সৈয়দ)।
- ৬। খলীফাতুল্লাহ অর্থ - আল্লাহর খলীফা।
- ৭। মসীহ মাওউদ অর্থ - প্রতিশ্রুত বা ওয়াদাকৃত মসীহ।
- ৮। খলীফাতুল মসীহ অর্থ- ‘প্রতিশ্রুত মসীহ বা ঈসা’-এর স্থলাভিষিক্ত খলীফা। যেমন খলীফাতুল রসূল অর্থ- রসূলের খলীফা; খলীফা অর্থ- স্থলাভিষিক্ত; রহমাতুল্লাহে আলাইহে (রহ.) অর্থ- তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।
- ৯। প্রথম খলিফা- হযরত হাফিয মাওলানা আলহাজ্জ হেকিম নুরুদ্দীন (রা.), খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (খিলাফতকাল: ১৯০৮ সালের ২৭ মে - ১৯১৪ সালের ১৩ই মার্চ)। (রা.) রাযিআল্লাহুতা’লা আনহু অর্থ: আল্লাহ তাঁর উপর সম্ভ্রষ্ট হোন; আউয়াল- প্রথম; নুরুদ্দিন অর্থ - ধর্মের জ্যোতি।
- ১০। দ্বিতীয় খলীফা- হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.), খলীফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মাওউদ (খিলাফতকাল: ১৯১৪ সালের ১৪ই মার্চ - ১৯৬৫ সালের ৭ ই নভেম্বর)। সানী - দ্বিতীয়; মুসলেহ অর্থ: সংশোধনকারী; মাওউদ অর্থ- প্রতিশ্রুত; বশীর উদ্দিন অর্থ - ধর্মের সুসংবাদদাতা; মাহমুদ অর্থ - প্রশংসিত; মুসলেহ অর্থ- সংশোধনকারী।
- ১১। তৃতীয় খলীফা- হযরত হাফিয মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফাতুল মসীহ সালেস (খিলাফতকাল: ১৯৬৫ সালের ৮ ই নভেম্বর - ১৯৮২ সালের ৮-৯ জুন)। সালেস- তৃতীয়; নাসের অর্থ- সাহায্যকারী।
- ১২। চতুর্থ খলীফা- হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) (খিলাফতকাল: ১৯৮২ সালের ১০ জুন - ২০০৩ সালের ১৯ শে এপ্রিল)। (রাহে.) রাহেমাতুল্লাহে আলাইহে বা রাহেমাহুল্লাহ অর্থ: আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন; রাবে- চতুর্থ; তাহের অর্থ - পবিত্র।

১৩। পঞ্চম খলীফা- হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.) (খিলাফতকাল: ২০০৩ সালের ২২ এপ্রিল); আইয়্যাদাহুল্লাহ তা'লা বেনাসরিহিল আজীজ অর্থ- আল্লাহ স্বীয় সহায়তা দ্বারা তাঁকে সাহায্য করুন, যিনি আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী; খামেস অর্থ- পঞ্চম; মাসরুর অর্থ- আনন্দিত/ প্রফুল্ল।

হযরের খুতবা শোনার গুরুত্ব:

যুগ খলীফার বাণী আমাদের রুহানী প্রেসক্রিপশন। জুম্মার খুতবার মাধ্যমে আমরা জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা পেয়ে থাকি। মনযোগ সহকারে জুমুআর খোতবা শোনাও এর উপরে আমলের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে আমাদের অন্তরে যে মরিচা জমে আমরা তা দূর করতে পারি।

মসজিদে খুতবা চলাকালীন সময়ে কেউ যদি কথা বলে, তাদের ইশারায় নিষেধ করতে হবে- কথা বলা যাবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, ইমাম সাহেব জুমুআর খুতবা দিচ্ছেন এমন সময় তুমি যদি পাশের কাউকে বলো, চুপ কর তাহলে এটাও তোমার ভুল কাজ হবে। (মুসলিম কিতাবুল জুমুআ)

জুমুআর খুতবা সরাসরি শুনুন

জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য এমটিএ-তে যুগ-খলীফার প্রোগ্রাম দেখা এবং বিশেষভাবে খুতবাসমূহ সরাসরি শোনা আবশ্যিক। সৈয়দনা খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন, আমি আপনাদের নিকট আশা করি যে, আপনারা নিজেদের নতুন প্রজন্মের সন্তানদেরকে খুতবা জুমুআ শুনান, পড়ান এবং বুঝান কেননা এই যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে আধুনিক আবিস্কারের মাধ্যমে যুগ-খলীফার খুতবা সারাবিশ্বে একই সময়ে প্রচার হচ্ছে। বিশ্বের সর্বত্র জামা'তগুলো এটি সরাসরি শুনে উপকৃত হচ্ছে এবং এক জাতিতে পরিণত হচ্ছে সেই সাথে একই উম্মত হবার দিকে ধাবমান হচ্ছে। যদি সবাই যুগ-খলীফার নসিহত সরাসরি শুনেন তাহলে সকলের তরবিয়ত একই মানের হবে, এর দ্বারা সবজাতি এক হয়ে যাবে, যদিও বাহ্যিকভাবে সকলেই ভিন্ন জাতি হোক না কেন। আপনাদেরকে আমি নসিহত করছি যে, আপনারা নিয়মিত খুতবা জুমুআ শুনুন এবং আপনাদের সন্তানদেরকে খুতবা জুমুআর গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝান। কেননা এর মাঝে কুরআন করীমের বাণী রয়েছে। মুহাম্মদ (সা.)-এর সর্বোৎকৃষ্ট জীবনাদর্শ রয়েছে এবং মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক থেকেও নসিহত উপস্থাপন করা হয়। এজন্য এটা তরবিয়তের একটা উত্তম মাধ্যম। এই খুতবা শুনার মাধ্যমে আপনাদের সন্তানরা

কুরআন, ইসলাম, মুহাম্মদ (সা.) এবং মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে ইনশাআল্লাহ্ এক গভীর সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। (দৈনিক আল-ফযল, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯১)

জামা'তের কাজ করার কল্যাণ

প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন,

“যদি সম্ভব হয়, প্রত্যেকের উচিত নিজ ধর্মের সেবা করা। সেই ব্যক্তি কত সৌভাগ্যবান যে নিজের সময় ও শক্তি, নিজের সার্বিক কার্যক্ষমতা, নিজের জীবন ও সম্পদ পুরোটাই আল্লাহর সেবায় ব্যয় করে।” (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন,

“সেই দিন সমাগত যেদিন জামা'তের কাজে অংশগ্রহণকারীরা মহাসম্মানের অধিকারী হবেন। সেসব মানুষের উত্তরাধিকারীরা, যারা জামা'তের কাজে অংশগ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে, তাদের প্রত্যাখ্যান করা হবে। যখন একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মতো দেশসমূহ জামা'তের কাজে পরামর্শ দেবার উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণকে সম্মানজনক মনে করবে, তখন যারা কখনোই জামা'তের কাজে আগ্রহ প্রকাশ করে নি, তাদের সম্মানেরা তখন সেই পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে। প্রত্যুত্তরে তাদের বলা হবে, যেহেতু তোমাদের পূর্বসূরীরা জামা'তের কর্মকাণ্ডকে কখনোই মূল্যায়ন করেন নি আর তাই এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলিতে তোমাদের পরামর্শ গৃহীত বা অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাই এই অবহেলা থেকে নিজেকে মুক্ত করুন এবং এই উপলব্ধি বিকশিত করুন, যদি কোন ব্যক্তি জামা'তের যে কোনো সভায় অংশগ্রহণ করে তাহলে তার প্রতি এত বেশি আশিস বর্ষণ করা হয় যে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্সিল সদস্যপদও সেই সমস্ত আশিসের কাছে তুচ্ছ হয়ে পড়ে। অতএব অন্য কোন কাজ থেকে পিছিয়ে হলেও জামা'তের সভায় অংশ নিন। কারণ আপনার অনুপস্থিতি জামা'তের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাবও ফেলবে না, কিন্তু এর ফলে আপনি ঐশ্বরিক অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।” (মজলিসে মুশাওয়ারাত রিপোর্ট, পৃ. ২৪)

রিয়ক বৃদ্ধির আমল

আল্লাহ্ রিয়কদাতা। যখনই কোনো বান্দার রিয়কের প্রয়োজন হয়, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে রিয়ক অন্বেষণ করে আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'লা বান্দাকে এমন উৎস থেকে রিয়ক দান করেন, যে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। কুরআন হাদিসে বর্ণিত, রিয়ক বৃদ্ধির কিছু আমল নিয়ে।

সালাত আদায় করলে রিয়ক বৃদ্ধি পায়: যথা সময়ে নামাজ আদায় করলে আল্লাহ্ রিয়কের দরজা উন্মুক্ত করে দেন। নামায আদায়কারীর রিয়কের দায়িত্ব তিনি নিয়ে নেন। আল্লাহ্ বলেছেন, “এবং তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের তাগিদ করতে থাকো, এবং তুমি নিজেও এতে ধৈর্য সহকারে কায়েম থাকো। আমরা তোমার নিকট কোন রিয়ক চাই না, বরং আমরাই তোমাকে রিয়ক দিচ্ছি। বস্তুতঃ তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য উত্তম পরিণাম।” (সূরা আত-তাহা: ১৩৩)

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন— রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা’লা বলেন, ‘হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করো। আমি তোমার অন্তরকে অভাবমুক্ত হিসাবে পরিপূর্ণ করে দেব এবং তোমার দারিদ্র্যের পথ দূর করে দেবো। আর যদি তা না করো; আমি তোমার হাত (দুনিয়ার) ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মেটাব না।’ (তিরমিজি, হাদিস: ২৪৬৬)

তওবা করলে রিয়ক বৃদ্ধি পায়: বেশি বেশি তাওবা ইস্তিগফারের দ্বারা রিয়ক বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ বলেন, ‘এবং আমি তাদেরকে বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, তিনি তোমাদের ওপর মুঘলধারে বর্ষণশীল মেঘ পাঠাবেন, এবং ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগানসমূহ উৎপন্ন করবেন এবং তোমাদের নহরসমূহ প্রবাহিত করবেন।’ (সূরা নুহ: ১১-১৩)

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত— রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বেশি বেশি তওবা-ইস্তিগফার করবে; আল্লাহ্ তা’লা সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন; সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন।’ (আবু দাউদ, হাদিস: ১৫১৮)

দান-সদকা করা: দান-সদকা করার মাধ্যমে রিয়ক বাড়ে। আল্লাহ্ তা’লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ‘....এবং তোমরা যা কিছু খরচ করবে তিনি অবশ্যই এর প্রতিদান দিবেন; বস্তুতঃ তিনি রিয়ক দানকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।’ (সূরা আস-সাবা: ৪০)

রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘প্রতিদিন সকালে দুইজন ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলে, হে আল্লাহ্! দানকারীকে তার দানের জন্য উত্তম প্রতিদান দিন। অপরজন বলে, হে আল্লাহ্! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।’ (বুখারি, হাদিস: ১৪৪২)

শুকরিয়া আদায় করা: শুকরিয়া আদায় করার দ্বারা নিয়ামত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তা’লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ‘যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হয়ে চল তাহলে নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আরো অধিক দান করব, কিন্তু যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তাহলে (জেনে

রেখো) আমার আযাব বড়ই কঠোর’। (সূরা ইবরাহিম: ৮)

রাসূল (সা.) আল্লাহর ইবাদত ও শুকরিয়া আদায়ের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন। সাহাবীদেরও তিনি ইবাদত ও শুকরিয়ার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে শিখিয়েছেন। মুআয ইবনে জাবাল বলেন, একদিন রাসূল (সা.) আমার হাত ধরে বললেন, প্রত্যেক নামাযের পর এ দোয়াটি পড়ো— আল্লাহুম্মা আ-ইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি আলা ইবাদাতিকা। অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনার যিকর, আপনার কৃতজ্ঞতা ও শোকর আদায় এবং সুন্দর করে আপনার ইবাদত করতে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। (সুনানে আবু দাউদ: ১৫২৪)

আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক: রিয়ক বৃদ্ধির অন্যতম আরেকটি আমল হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করতে এবং তাদের হক যথাযথভাবে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তা’লা। (সূরা আন-নিসা: ৩৭; সূরা বনী ইসরাঈল: ২৭)

আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রাসূল (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি কামনা করে তার রিয়ক প্রশস্ত করে দেওয়া হোক এবং আয়ু দীর্ঘ করা হোক, সে যেন তার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।’ (বুখারি, হাদিস: ৫৯৮৫)

দোয়া ও এর কবুলিয়ত

“নামাযে সূরা ফাতিহার দোয়া খুবই প্রভাবশালী। মজা না লাগলে আর খুব বিশ্বাস লাগলেও একে অব্যাহত রাখা উচিত। অর্থাৎ কখনও আয়াত ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাজিন এবং কখনও ইহদিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম এবং সেজদায় ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুমু বিরাহমাতিকা আসতাগিছ-এর পুনরুক্তি করা উচিত। জীবনের কোন বিশ্বাস নেই। পার্থিব সাজসজ্জা শুধু ধোঁকার জিনিস। রাতে দোয়া করো, সকালে দোয়া করো, জঙ্গলে গিয়ে দোয়া করো, জামা’তের সাথে দোয়া করো, আল্লাহ তা’লা যেন নাফসে আম্মারাহ হতে পরিত্রাণ দেন। যতদূর সম্ভব কান্নার অভ্যাস গড়ে তোল। কেননা যে কান্নাকাটি করে তার ওপর রহম করা হয়। চেষ্টা করো কুরআনে বর্ণিত নির্দেশনানুযায়ী খোদা তা’লার সামনে যেন পাকসাফ হয়ে যেতে পারো। অলসতা কোন কাজের জিনিস নয় এবং চেষ্টা ছাড়া কেউ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।” (তথ্যসূত্র— হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কর্তৃক হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আহসান সাহেব-এর কাছে প্রেরিত চিঠিপত্র)

দোয়া কবুল হবার কিছু সময়:

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাকে দোয়া করার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ প্রদান করেছেন। যেমন— তিনি বলেছেন, আমার কাছে দোয়া কর আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব। (সূরা আল মু'মিন: ৬১)

আল্লাহ্ তা'লা মু'মিন বান্দার দোয়া সব সময় কবুল করে থাকেন। যে সময়গুলো দোয়া করলে আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চিতভাবে বান্দার দোয়া কবুল করেন। আর তা হলো—

- ১। রাতের শেষ তৃতীয়াংশে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘প্রত্যেক দিন রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আমাদের রব সবচেয়ে নীচের (প্রথম) আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন— কে আছে? আমাকে ডাকো, আমি তোমার ডাকে সাড়া দেব। কে আছে? আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দান করবো। কে আছে? আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব।’ (বুখারি)
- ২। আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। (আবু দাউদ)
- ৩। জুমুআর দিনের দোয়া। জুমুআর দিনে একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে যে সময়টা কোনো মু'মিন আল্লাহ্র কাছে যাই দোয়া করে, আল্লাহ্ তাই কবুল করেন। তোমরা এই মুহূর্তটিকে আসরের শেষে অনুসন্ধান কর। (বুখারি)
- ৪। সেজদার সময়ের দোয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যখন কোনো বান্দা সিজদায় থাকে, তখন সে আল্লাহ্ তা'লার অতি নিকটে থাকে। সুতরাং তখন বেশি করে দোয়া করো।” (মুসলিম)
- ৫। কদরের রাতের দোয়া। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে সাওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল কদরে রাত জেগে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে, তার আগের (জীবনের) সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।’ (বুখারি)
- ৬। বৃষ্টি হবার সময়ের দোয়া। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘দুই সময়ের দোয়া ফেরানো হয় না। আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া আর বৃষ্টি বর্ষণের সময়ের দোয়া।’ (আবু দাউদ)
- ৭। আরাফাতের দিনের দোয়া। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘দোয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো আরাফাতের দিনের দোয়া।’ (তিরমিযি)
- ৮। যিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিনের দোয়া। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিনের আমল অন্য যে কোন দিনের আমলের চেয়ে উত্তম।’ (বুখারি)

- ৯। রোযাদার ব্যক্তির ইফতারের সময়ের দোয়া। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘ও ব্যক্তির দোয়া কখনো ফিরিয়ে দেয়া হয় না। যখন রোযাদার ব্যক্তি ইফতার করে। ন্যায় পরায়ন শাসক। নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়া।’ (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী)

তাছাড়া সুবহে সাদিকের পূর্বে, অসুস্থ অবস্থায়, সফরকালীন সময়ে, জিহাদের ময়দানে, এবং যুলুম ও অত্যাচার বরদাস্তকালীন ধৈর্যধারণ সময়ে, দান-সদকা করার পড়ে, কুরআন খতম দেয়ার পড়ে, এছাড়াও মায়ের দোয়া কবুল হয়। আল্লাহ তা’লার “আল্লাহ্” নাম সব গুণবাচক নামের সমষ্টি অর্থাৎ সব গুণবাচক নামের সমন্বয় “আল্লাহ্” নামে রয়েছে। তাই শুধু “আল্লাহ্” নাম ডাকলেও যে কোন ব্যাপারে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দোয়া করার সাথে সাথে আল্লাহ তা’লার বিশেষ বিশেষ গুণবাচক নামের সম্পর্ক রয়েছে। তাই দোয়ার পূর্বে নিজের প্রয়োজনের তাগিদ অনুসারে আল্লাহ তা’লার সেই গুণবাচক নামকে নিরূপণ করে তাঁকে সেই নামে ডাকা উচিত। তাহলে শীঘ্রই দোয়া কবুল হবে। দোয়া শুরুতে নবী করীম (সা.)-এর উপর অধিক সংখ্যায় দরুদ শরীফ পাঠ করলে দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায়। কেননা সব কল্যাণ এবং আশিস আমরা তাঁর বদৌলতেই পেয়ে থাকি। মু’মিন ব্যক্তিদের উচিত এ সময় ও দিনক্ষণগুলোতে বেশি বেশি তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। নিজের একান্ত চাহিদাগুলো পূরণে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। (সংগৃহীত)

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন- মহানবী (সা.) বলেছেন, নিজের দোয়া যখন গৃহীত হয়েছে বলে বুঝতে পারো, তখন এ দোয়া করো, “আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি বেইজ্জাতিহি ও জালালিহি তাতিম্মুস সলিহাত” অর্থাৎ সব প্রশংসা ঐ সত্তার, যার সম্মান ও প্রতাপের কারণে সব পুণ্যকর্ম পরিপূর্ণভাবে পরিসমাপ্ত হয়। (মুসতাদেরেক হাকেম)

হযূর আনোয়ার (আই.) জুমুআর খুতবা ১৮ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে বলেন, “এক স্থানে আল্লাহ তা’লা সূরা হামীম আস্ সাজদার ৩৭ নং আয়াতে বলেন- শয়তানের পক্ষ থেকে যদি কোন বিভ্রান্তিকর বিষয়ে তোমার কর্তগোচর হয়, শয়তান যদি এমন কথা পৌঁছায় যা আহসান কওল বা উত্তম কথার পরিপন্থি, সে ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য যাচনা করো। তুমি আল্লাহ তা’লার আশ্রয়ে আসার জন্য অনেক বেশি দোয়া করো আর ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম’ এবং ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ পাঠ করো। সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা’লা নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, পবিত্র উদ্দেশ্যে যদি দোয়া করা হয় তাহলে আল্লাহ তা’লা অবশ্যই তা শ্রবণ করেন।”

বিয়ে-শাদী

هُنَّ بَيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ بَيَاسٌ لَهُنَّ

“তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ এবং তোমরা স্বামীগণ তাদের জন্য পোশাক স্বরূপ।” (সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৮)

গায়ের আহমদী বিবাহের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাবধান বাণী:

“.... যারা বিরোধী মৌলভীদের প্রভাবে বা ছত্রছায়ায় হিংসা-বিদ্বেষ আর কার্পণ্য এবং শত্রুতার চরম সীমায় উপনীত, যতদিন তারা তওবা করে এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত না হবে, ততদিন তাদের সাথে আমাদের জামা'তের সদস্যদের নতুন বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই আমাদের জামা'তের সদস্যদের এমন কারও সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ানো সমীচীন হবে না- যারা আমাদেরকে কাফের বলে, আমাদেরকে দাজ্জাল বলে আখ্যা দেয় অথবা নিজেরা না বললেও এমন বক্তব্য প্রদানকারীদের গুণগান করে এবং তাদের অনুগামী হয়। অতএব জামা'তের সকল সদস্য মন দিয়ে শুনুন! সত্যনিষ্ঠ হবার জন্য এ শর্ত মানা আবশ্যিক।” (মজমুআয়ে ইশতেহারাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০-৫১)

আমাদের জামা'তের মেয়েদের উদ্দেশ্যে নসিহত:

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.) বলেন, “পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো মোহতরমা যারিনা আখতার সাহেবার- যিনি মির্যা নাসীর আহমদ সাহেবের স্ত্রী। তিনি [হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর] সাহাবীদের সন্তান ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ছিলেন। নিজ পিতা-মাতা এবং শশুর-শাশুড়ি উভয়ের সেবা করেছেন তিনি। ওয়াক্কেফে যিন্দেগী স্বামীর সাথে অত্যন্ত বিশ্বস্ততা এবং স্বল্পতুষ্টতার সাথে জীবনযাপন করেছেন। ঘানায় থাকাকালীন সময়ে নিজ সন্তানদের নিয়ে অত্যন্ত দরিদ্রপূর্ণ জীবনযাপন করেছেন, কিন্তু কখনো কোনো ধরনের অভিযোগ করেন নি।” /২১ মে ২০২১ তারিখের জুমুআর খুতবা]

এসব স্মৃতিচারণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদেরকেও নিজ জীবনে সেগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে।

খোদার নিকট পুণ্যবতী ও অল্পে সন্তুষ্ট বলে পরিগণিত হও:

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.) নারীদের প্রতি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর নির্দেশ:

“হে নারীগণ! তাকওয়া অবলম্বন করো। দুনিয়া ও এর সৌন্দর্যের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়ো না। জাতির গৌরব কোরো না। কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি হাসিবিদ্রুপ কোরো না। স্বামীর কাছে এমন কিছু চাইবে না যা তাঁর ক্ষমতার বাইরে। চেষ্টা করো যেন নিষ্পাপ ও পবিত্র অবস্থায় কবরে প্রবেশ করতে পারো। খোদা তা’লার প্রতি কর্তব্য, নামায, রোযা ইত্যাদিতে শিথিল হয়ো না। মনপ্রাণ দিয়ে নিজ স্বামীর অনুগত হও। কারণ তাঁর সম্মানের অনেকাংশ তোমার হাতে রয়েছে। তোমরা নিজেদের এই দায়িত্ব এমন উত্তমভাবে পালন করো যেন খোদার নিকট পুণ্যবতী ও অল্পে সন্তুষ্ট বলে পরিগণিত হও। অপব্যয় করো না, স্বামীর ধন অন্যায়ভাবে খরচ কোরো না। চুরি কোরো না, পরনিন্দা কোরো না। এক নারী অপর নারী ও পুরুষের প্রতি মিথ্যা অপবাদ কোরো না। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ. ১০০)

লৌকিকতা

আল্লাহ তা’লা লৌকিকতার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ‘অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর জন্য, যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন। যারা লোক-দেখানোর জন্য তা করে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অন্যকে দেয় না। (সূরা মাউন: ৫-৮)

লৌকিকতা বা লোক-দেখানো কাজ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন,

- ১। যে কাজে বিন্দু পরিমাণও লৌকিকতা থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়। যেমন- দামী খাবারে কুকুর মুখ দিলে তা নষ্ট হয়ে যায়। (মালফুযাত, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৬৫৯)
- ২। লৌকিকতা হলো আমল নষ্ট করার ভয়ংকর পোকা। (মালফুযাত, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৬৫৮)
- ৩। লোক-দেখানোর জন্য পুণ্যকর্ম লানতস্বরূপ। (মালফুযাত তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৬)
- ৪। লৌকিকতা একটি বড়ো ধরনের রোগ। (মালফুযাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৬৮)
- ৫। লৌকিকতা মন্দ নয় কিন্তু শর্ত হল, যদি তা আল্লাহর জন্য করা হয় তবেই। (মালফুযাত, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৪৩)

- ৬। লৌকিকতা গোপন থাকে না। (মলফুযাত, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১১৯)
- ৭। লৌকিকতা ইদুরের মতো যা ভিতরে ভিতরে আমল খেয়ে ফেলে। আগুন যেভাবে খড়্‌কুটা পুড়িয়ে ফেলে রিয়াও নেকীকে পুড়িয়ে ফেলে। (মালফুযাত, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৬৬)
- ৮। নেকীর বড়ো শত্রু হলো লৌকিকতা, ভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে রিয়া থেকে বিরত থাকে। (মালফুযাত, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৬৬)
- ৯। লৌকিকতা বা লোক-দেখানো কাজ মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। (মালফুযাত, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৮)

পর্দা

ইসলামে পর্দার গুরুত্ব সূরা আন-নূরের ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন, “এবং তুমি মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযুক্ত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফায়ত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে, কেবল তা ব্যতিরেকে যা স্বতঃই প্রকাশ পায়, এবং তারা উড়নাগুলিকে নিজেদের বক্ষঃদেশের উপর টেনে নেয়...”।”

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে— রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, হাতের ব্যভিচার পর নারীকে স্পর্শ করা, পায়ের ব্যভিচার সেই উদ্দেশ্যে যাতায়াত করা, চোখের ব্যভিচার পর নারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করা, কানের ব্যভিচার অশ্লীল কথাবার্তা শ্রবণ করা, মুখের ব্যভিচার পর নারী বা পরপুরুষের সাথে প্রেমালাপ করা এবং মনের ব্যভিচার হলো অবৈধ ভালোবাসা কামনা করা। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

সূরা আরাফ ২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেছেন, “কিন্তু তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর আদেশাবলির অন্যতম, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।” কাজেই দেহ ও মন তথা ইন্দ্রিয় খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে পর্দা পালন করা উচিত।

মাহরাম আত্মীয়স্বজনদের সামনে পর্দায় শিথিলতা:

মাহরাম কি? যে সকল পুরুষের সামনে নারীর দেখা দেওয়া, কথা বলা জায়েজ এবং যাদের সাথে বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণ হারাম তাদেরকে শরীয়তের পরিভাষায় মাহরাম বলে।

মাহরাম কারা? পর্দা কীভাবে করতে হবে এবং কাদের সাথে করতে হবে, এ বিষয়ে সূরা আন-নূরের ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'লা নারীর মাহরাম নির্ধারিত করে দিয়েছেন। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হল-

“এবং তুমি মু'মিন নারীদেরকে বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফায়ত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে, কেবল তা ব্যতিরেকে যা স্বতঃই প্রকাশ পায়; এবং তারা উড়নাগুলিকে নিজেদের বক্ষঃদেশের উপর টাঙিয়ে নেয়, এবং তারা যেন তাহাদের স্বামী অথবা তাদের পিতা অথবা তাদের স্বামীর পিতা অথবা তাদের পুত্রদের অথবা তাদের স্বামীর পুত্রদের অথবা তাদের ভ্রাতাদের অথবা তাদের ভ্রাতুষ্পুত্রদের অথবা নিজেদের ভগ্নীপুত্রদের অথবা তাদের সমশ্রেণির নারীদের অথবা তারা যাদের মালিক হয়েছে তাদের ডান হাত অথবা পুরুষদের মধ্য হতে যৌনকামনাবিহীন অধীনস্থ ব্যক্তিদের অথবা নারীদের গোপন বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালকদের ব্যতীত অপর কারও নিকট নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। এবং তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে যেন তারা সজোরে পা দিয়া আঘাত না করে। এবং হে মু'মিনরা! তোমরা সকলে আল্লাহ দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।”

খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.) বলেন: “এতে যে সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও পরিজনের উল্লেখ রয়েছে তাদের সাথে পর্দার বিষয়ে শিথিলতা রয়েছে। তাদের মাঝে সেসব লোক অন্তর্ভুক্ত যারা একেবারে নিকটাত্মীয়। অর্থাৎ স্বামী, বাবা অথবা স্বশ্বশ্বুর, ভাই বা ভতিজা, ভাগনা প্রমুখ। এছাড়া নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক নেই এমন সবার সাথে পর্দা করতে হবে।” [খুতবা জুমুআ, ৩০ জানুয়ারি ২০০৪, বায়তুল ফতুহ, লন্ডন: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৯ এপ্রিল ২০০৪]

পর্দা সম্বন্ধে কুরআন করীমের সূরা নূরের ৩১ ও ৩২ নং আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, খোদা তা'লা এই আয়াতে শুধু সতীত্ব অর্জনের এক উচ্চ শিক্ষাই দান করেন নি বরং মানুষকে পবিত্র থাকার পাঁচটি পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছেন আর সেগুলো হল-

- ১) না-মাহরাম নারীদের দেখা থেকে পুরুষের চোখকে বাঁচানো।
- ২) না মাহরাম পুরুষের কণ্ঠ শ্রবণ থেকে নারীর কান বাঁচানো।
- ৩) না মাহরাম নারী-পুরুষ সম্পর্কে গল্প না শুনানো।

৪) আলোচিত কুকর্মের সূচনাকারী সকল অনুষ্ঠান হতে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা।

৫) বিয়ে না করলে রোযা রাখা ইত্যাদি।

এখানে আমরা দাবির সাথে বলতে পারি, এই উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার মাধ্যমে কুরআন শরীফ এসবের প্রতিকার বর্ণনা করেছে। (তথ্যসূত্র: ইসলামী নীতিদর্শন)

তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা:

প্রতিটি কাজের সাথে শর্ত যুক্ত থাকে। অনুরূপভাবে দোয়াকারী ব্যক্তির জন্য মুত্তাকী হওয়ার শর্ত আবশ্যিকীয়। নিজেকে পবিত্র করে আল্লাহর রঙে রঙিন হবার নাম তাকওয়া। এ হলো প্রতিটি পুণ্য কর্মের মূল।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, “এক একটি সৎ কর্মের মূলে এই তাকওয়াই রয়েছে, এই মূল যদি অক্ষত থাকে তাহলে সবকিছুই ঠিক থাকে।” সুতরাং ঐশী প্রেম অর্জন করতে হলে তাকওয়া অবলম্বন হলো মৌলিক শর্ত।

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের দোয়া কবুলকারী খোদা বলেন:

১. “আল্লাহ মুত্তাকী বান্দাদের ভালোবাসেন।” (সূরা আত-তওবা: ৭)
২. “উত্তম পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই হয়ে থাকে।” (সূরা হুদ: ৫০)
৩. “পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যকারীগণই পূর্ণাঙ্গীণ তাকওয়ার অধিকারী হয়ে থাকে।” (সূরা আশ-শুআরা: ১৮০)
৪. “উদ্দেশ্য লাভের মাধ্যম হলো তাকওয়া।” (সূরা আল-মায়দা: ১০১)
৫. “মুত্তাকীদের প্রতি কৃপা করা হয়।” (সূরা আল-আনআম: ১৫৬)
৬. “বিপদ হতে মুক্তি পাবার মাধ্যম হলো তাকওয়া।” (সূরা আত-তালাক: ৩)
৭. “মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিদর্শন দেওয়া হয়।” (সূরা আল-আনফাল: ৩০)

আল্লাতালার পরম করুণা ও দয়ায় তিনি তাঁর বান্দাদের দোয়া করতে শিখিয়ে বলেছেন, তোমরা দোয়া কর। তবে তোমাদের দোয়া ঈমান, আনুগত্য ও তাকওয়ার সাথে করতে হবে। তাহলে আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো এবং তোমরা আমার নৈকট্যের তথ্য জ্ঞান লাভ করবে। (সংগৃহীত: দোয়াইয়্যাহ খাজায়েন)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও বিশ্বব্যাপী সামগ্রিক
সুরক্ষার জন্য সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন
খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.)-এর

বিশেষ দোয়ার তহরীক

১. 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মাদ।' (প্রত্যহ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ২০০বার, ১৫-২৫ বছরের যুবকেরা ১০০বার আর কিশোররা ৩৩বার পাঠ করুন)
অর্থ: 'পবিত্র সেই আল্লাহ- যিনি তাঁর যাবতীয় প্রশংসাসহ বিরাজমান। পবিত্র সেই আল্লাহ- যিনি সমস্ত মাহাত্মের অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ করো।'
২. ইস্তেগফার (আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়া আতুব্ব ইলাইহি)। (এই দোয়া প্রত্যহ কমপক্ষে ১০০বার পাঠ করুন)
অর্থ: 'আমি আমার প্রতিপালক-প্রভু আল্লাহ্ তা'লার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি আর তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।'
৩. 'রাব্বী কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বী ফাহুফায়নী ওয়ানসুরনী ওয়ার হামনী।' (প্রত্যহ ১০০বার পাঠ করুন)
অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক-প্রভু! সবকিছুই তোমার সেবক। হে আমার প্রতিপালক-প্রভু! তুমি আমাকে নিরাপদে রেখো, তুমি আমাকে সাহায্য করো এবং তুমি আমার প্রতি কৃপা করো।'
৪. আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকাকী নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকাকী মিন গুরুরিহিম। (আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)
অর্থ: 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা (অবিস্বাসী শত্রুদের বিপক্ষে) তোমাকে তাদের অন্তরে (ঢালস্বরূপ) রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'
৫. বেশি করে সদকাহ প্রদান করার অভ্যাস।
৬. নফল নামায ও ইবাদাত করা।